গিরিশজীবনের বর্ণালি

সুমনা সাহা

''কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে॥
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া।
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া॥...
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তাঁয়।
কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়॥
কিবা প্রয়োজন তারে পুছিলে আবার।
উত্তর করিল কার্য করিব তোমার॥
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর।
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর॥''

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ভক্তভৈরব' নামে ভূষিত—তাঁকে কেন্দ্র করে ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব লীলা ভক্তজনের পরম আস্বাদ্য। উদ্ধৃত কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে গিরিশ সম্বন্ধে ঠাকুরের ভাবস্ফুট দর্শন।

একইসঙ্গে গিরিশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতির এক কিংবদন্তি নাট্যপ্রতিভা। তাঁর জীবন বাংলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর নাট্যকৃতি বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য। আশিরও বেশি নাটক রচনা করেছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম দিকে রচনা করেছিলেন পৌরাণিক নাটক—রাবণবধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮১), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২) প্রভৃতি। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তিনি একটি নতুন রূপ দিয়ে নাটকের সংলাপের উপযোগী করে তোলেন। এই নতুন প্রয়োগ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত। ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৯-র মধ্যে তিনি রচনা করেন 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি ভক্তিপ্রধান সন্তচরিত্র-নির্ভর নাটক। ১৮৮৯ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে তাঁর নাট্যপ্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি। 'জনা' নাটকটিও (১৮৯৪) এই পর্বের। ১৯০৫ সালের পর থেকে তাঁর নাটকে দেখা দিল দেশপ্রেমের উদ্দীপনা। এই সময়ের

নাটকের মধ্যে অন্যতম সিরাজদৌল্লা (১৯০৫), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭) প্রভৃতি। জীবনের শেষদিকে আবার ফিরে এসেছিলেন শান্ত ভক্তিভাবের নাটক নিয়ে। তাদের মধ্যে অন্যতম শঙ্করাচার্য (১৯০৯), অশোক (১৯১১), তপোবল (১৯১১)। নাটক রচনার সময় গিরিশ কখনও বসে, কখনও বা বেড়াতে বেড়াতে ভাবে বিভোর হয়ে এত দ্রুত বলে যেতেন যে, শ্রুতিলেখক দোয়াতের কালি তুলতে সময় পেতেন না। হাতের লেখা ভাল না হওয়ায় গিরিশ নিজের হাতে প্রায় কিছুই লিখতেন না, এমনকী চিঠিপত্র পর্যন্ত। শেষ পনেরো বছর তাঁর 'গণেশ' হয়েছিলেন অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। শুরুর দিকে অবিনাশ কী প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তেন, তা তাঁর মুখেই শোনা যাক—''প্রথম প্রথম আমি তাঁহার সহিত লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'কী?' বলিয়া পুনরুল্লেখ করিতে অনুরোধ করিতাম। গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কী ক্ষতি করিলে জানো! যাহা বলিয়াছি তাহা তো মনেই নাই, আর পরে যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাও গোলমাল হইয়া গেল, যে স্থান লিখিতে না পারিবে, দুইটি তারা (স্টার) চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার পর লিখিয়া যাইবে, পরে আমি পরিত্যক্ত অংশ পূরণ করিয়া দিব। যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিকটি আর তেমন বাহির না হইলেও একটা লাভ এই হইবে, যাহা বলিতে যাইতেছিলাম সেটি ঠিক থাকিবে।' ''

নাটকরচনাকালে গিরিশচন্দ্র প্রথম দুটি অঙ্ক লিখতেই একটু চিন্তাভাবনার সময় নিতেন। একবার শুরুটা পছন্দ হয়ে গেলে শেষ করতে বেশি সময় লাগত না। সে হোক না মধ্যরাত অথবা নাটকের অভিনয়ের মধ্যেই। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকটি সারা রাত ধরে লেখা হয়েছিল। রাত জাগার অভ্যাস না থাকায় অনুলেখক অবিনাশচন্দ্র মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়তেন, ফলে লেখার বিঘ্ন হত। যে-রাতে নাটকটির চতুর্থ অঙ্ক লেখা হয়, সে-রাতে অবিনাশ তিন-চার বাটি চা খেয়ে লেখা শুরু করেন। রাত আড়াইটে নাগাদ লেখা শেষ হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ঘুমোতে যেতে বলায় অবিনাশচন্দ্র বলেন, ''আমার চোখে আদৌ ঘুম নেই, লেখা চলুক না কেন?''

গিরিশচন্দ্র সবসময়ই গর্ব করে বলতেন, সরস্বতী তাঁর জিভের ডগায় অধিষ্ঠিতা। সুতরাং অবিনাশের কথা শুনে বললেন, ''বেশ আমি প্রস্তুত, আমার সব সাজানো রয়েছে। তুমি পারলেই হল, লিখতে চাও লেখো।'' পঞ্চম অঙ্ক লেখা শুরু হল। নাটক শেষ করে সর্বশেষ গান—'হের হর মনমোহিনী' গানের প্রথম ছত্র লিখে গিরিশ বললেন, ''থাক, আজ এই পর্যন্ত। গানগুলো সব কাল বেঁধে দেব। তুমি দরজা-জানালা খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।'' জানালা খুলতেই রোদে ঘর ভরে গেল। ঘড়িতে দেখা গেল সকাল ৮টা বাজে। ব্যস্ত হয়ে গিরিশ বললেন, ''যাও বাড়ি যাও, স্নানাহার করে সমস্ত দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পর এসো।''

থিয়েটার হলের মধ্যে নাটক অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গিরিশ 'মণিহরণ' গীতিনাট্য রচনা শুরু করে দেন। নাটক লেখা হবে, সুতরাং অনুলেখক খাতা-পেনসিল নিয়ে প্রস্তুত। গিরিশচন্দ্র স্টেজে অভিনয় করে বাইরে এসে বলে যেতে শুরু করলেন। একজন লোক রাখা হল গিরিশ ঘোষকে অভিনয়ের সময় ডেকে দেওয়ার জন্য। এভাবে অভিনয় এবং অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গীতিনাট্যটি লেখা হয়ে গেল। অভিনয় শেষে স্টেজে বসে এ-গীতিনাট্যের আঠাশটি গান বেঁধে গিরিশ ম্যানেজারের হাতে দিলেন। বললেন, ''যদি চাও আর একখানি নকশা আজই লিখে দিতে পারি।'' ম্যানেজার আগ্রহ দেখালে অবিশ্বাস্য প্রতিভাধর গিরিশ ওই রাতেই 'চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি' নামে আর একটি নাটকের খসড়া লিখে দিয়ে বাড়ি রওনা হলেন।

নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি বিপুল। তাঁর সমকালের বহু বিশিষ্টজন তাঁকে শেক্সপিয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাংলা নাট্যজগতে তাঁর সমতুল প্রতিভা আর দেখা যায়নি।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে পুরাণপ্রসঙ্গ শুনে আর বড় হয়ে দিগম্বর কথকের কথকতা শুনে পৌরাণিক নাটক লেখা গিরিশের সহজসাধ্য হয়েছিল। পুরাণের প্রতি ভালবাসা তাঁর জীবনব্যাপী যে কতদূর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা গিরিশের মুখে যিনি কখনও পুরাণপ্রসঙ্গ শুনেছেন, এবং তার আলোচনায় গিরিশের শ্রদ্ধা ও উন্মত্ততা দেখেছেন, তিনিই বুঝেছেন। গিরিশচন্দ্রের নিকটাত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে শুনে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'গিরিশ প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন : কবি, অভিনেতা, সুরসিক, সুপণ্ডিত বন্ধু কেদারনাথ চৌধুরী যেদিন গিরিশের বাসায় উপস্থিত হতেন, সেদিন পুরাণ, ইতিহাস ও নাট্যপ্রসঙ্গে মজলিশ ভারি জমে উঠত। এই দুই রসপাগলের হাতে হুঁকো, হাত থেকে নামছে, অথচ মুখে উঠছে না, তামাক মনের দুঃখে আপনি পুড়ে শেষ হচ্ছে, কলকে বদলানো হচ্ছে, কিন্তু কথার তোড়ে ধূমপানের অবসর আর হচ্ছে না। বোগনো ভরা পান উজাড় হচ্ছে, পৌরাণিক চরিত্রের বিশ্লেষণ চলছে, চলছে কবিতা আবৃত্তি, শ্রোতারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে মুগ্ধ, নিশ্চল—বেলা দুটো বেজে গেলেও ঘরে ফেরার কথা মনে নেই। যাওয়ার সময় কৃত্রিম ক্ষোভে সকলেই বলে যেতেন, ''এ কর্মনাশা ঘর, এখানে এসে ওঠবারও জো নেই, আর কোনও কাজ হবারও জো নেই।''

পুরাণের কেউ নিন্দা করলে গিরিশ বলতেন, ''তুমি কি বলছ তুমি নিজেই তা জান না।'' পুরাণ সম্বন্ধে গিরিশের আর-এক দক্ষতা ছিল তাঁর অদ্ভুত কথকতাশক্তি। কেদারবাবুর বাসায় একদিন কথা উঠল যে, হাজার ক্ষমতাবান কথক হন, এক আসনে বসে একজনই কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভাবানুযায়ী অভিনয় করে রসসৃষ্টি করতে পারবেন—এমন ক্ষমতা দুর্লভ। তখন শ্রীধর, ধরণী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কথকগণ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কথকতার উপর শিক্ষিত মানুষের শ্রদ্ধারও অভাব রয়েছে। গিরিশচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে পরদিন নিজেই তা করে দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন এবং সত্যিই পরদিন কেদারনাথের বাসায় ধ্রুবচরিত্র নিজেই সম্পূর্ণ অভিনয় করে স্বীয় কথকতা-প্রতিভায় সকলকে মুগ্ধ করলেন। ওই দিনের কথকতার ধারাতেই গিরিশের 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকটি রচিত।

একজন অভিনেতা তথা নাট্যস্রষ্টার সাধনা কী বস্তু, তার উল্লেখ পাই গিরিশচন্দ্রের নিজের ভাষাতেই : ''নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যাঁহার ধ্যানধারণা শক্তি নাই তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক সমীপে নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর, কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে।... নাটক-বর্ণিত ভূমিকা কোথাও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না... মাইকেল মধুসূদন রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত 'মেঘনাদবধ' উচ্চ কাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্তিত 'মেঘনাদবধ' নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তখন রামকে

দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়—'জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর' ইত্যাদি।"

প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টিবলে গিরিশ বুঝেছিলেন, হাত-পা নাড়লেই অভিনয় হয় না। সৈনিক পুরুষ কথা বলতে বলতে আনমনে তরবারিমুখে ব্যূহ রচনা করছে, মালিনী কথা বলতে বলতে আঙ্গুলের ভঙ্গিতে মালা গাঁথছে, কেরানি কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে আঙ্গুল দিয়ে কী লেখে, প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখে আনমনা হয়, বেদে চলতে চলতে ডিগবাজি খায়, গায়ক শিস দেয়, বাজনদার অঙ্গ বাজায়। এইসবের প্রতি অভিনেতার দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্তব্য। গিরিশ উপলব্ধি করেছিলেন, ''ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না। নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ডে সাক্ষিস্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না, নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না, সহযোগী-অভিনেতা ঠিক বলিতেছে কি না, যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না, রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছেন কি না। এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ সাক্ষিস্বরূপ থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ—তন্ময় অংশই অধিক।"

অমৃতলাল বসু বলেছিলেন, ''এক পশুপতির ভূমিকার জন্যই যে কোনও দেশে গিরিশ রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর শুনিব না, প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তিও আর দেখিব না।" প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনী বলতেন, ''গিরিশচন্দ্র কারাগারে আবদ্ধ পশুপতি বেশে যখন বলিতেন, 'মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়?' আবার পরক্ষণেই অগ্নিদগ্ধ স্বীয় গৃহখানি দেখিতে পাইয়া 'মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো, ছাড়ো' বলিয়া সহসা উন্মত্তাবস্থায় সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইতেন, স্মরণ হইলে আজিও দেহ কণ্টকিত হয়। এই অর্ধশতাব্দিমধ্যে এরূপ অভিনয় আর দ্বিতীয় বার দেখিলাম না।"

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র—একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''গিরিশ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজে নাটক লিখিয়া, নাটকের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং অভিনয় করিয়া, অভিনয়ের উচ্চাদর্শ দেখাইয়া রঙ্গালয়কে জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন।... ইংরাজ জাতি যেমন সেক্ষপীয়রের গর্ব্ব করিয়া থাকে, জার্মানি যেমন 'গেটের' গর্ব্ব করে, আমরাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে 'গিরিশচন্দ্রের' গর্ব্ব করিতে পারি... দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাণীর সঙ্গে মিলাইয়া আমরা তাঁহার ভাষায় বলিব 'অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ভারতেরই পদতলে বসিয়া গিরিশের নাটক, গীত ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে।' "

গিরিশের 'আমোদের উপাসনা'

গিরিশের জীবনের সকল কর্ম প্রচেষ্টা, ধর্ম ও সকল আকাঙ্ক্ষার মূল সুর ছিল আনন্দের সন্ধান—সাদা বাংলায় যাকে তিনি 'আমোদ' বলতেন—''যাতে আমোদ পাইনি, এমন কাজ আমি কখনও করিনি; যদি ভগবানকে খুঁজে আমোদ না পেতুম, পরমহংসদেবের সঙ্গ যদি আমোদ না দিত, তা হলে সেদিকে ঘেঁষতুম না।" 'বিষাদ' নাটকে অলর্ক বলে, ''আমোদের উপাসনা করতে হয়, আমোদের যদি সখ হোলো তবে আমোদ এল, না হলে কেন মাথা খোঁড়ো না..., আমোদ আর হচ্ছে না।"

সুরাপানজনিত আমোদ গিরিশকে আকর্ষণ করলেও তিনি সাধারণ মদ্যপায়ীর মতো সুরার কুপ্রভাব সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। 'অশোক'-এ তিনি

হীন আমোদের উল্লেখ করে বলছেন, ''এ আমোদ না ছাই।'' 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ বলছেন, ''এ কি জান? বিষ বল বিষ, অমৃত বল অমৃত।'' আবার 'মায়াবসান'-এ কালীকিংকর বলছেন, ''এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেকের অট্টালিকা মাঠ করেছে। দেবাসুর উভয়েই এ পান করে।''

হীন সাহচর্যেও গিরিশের মুখে কেউ কখনও নীচ প্রসঙ্গ শোনেননি। উন্নতকায়, প্রশস্তললাট, বিশালনয়ন, বিশালবক্ষ গিরিশের অন্তরে-বাহিরে কোথাও ক্ষুদ্রতা ছিল না। গুণেও না, দোষেও না। এটি উল্লেখ করার কারণ, তিনি নিজেই বলতেন, ''Speak of me as I am.''—''আমি ঠিক যা, তাই বোলো, কিছু লুকিয়ো না।''

নাট্যবোদ্ধাদের মতে, ''অ্যারিস্টটল যাকে 'The vital principle, the very soul of drama' বলেছেন নাটকে সেই 'অ্যাকশন' বা নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র সুদক্ষ ছিলেন। নিজে অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক ছিলেন বলেই হয়তো তিনি এই দুরূহ কৌশল সহজে আয়ত্ত করেছিলেন। দর্শককে বুকচাপা নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করানো অর্থাৎ 'ড্রামাটিক সাসপেন্স' বজায় রাখার আর্ট তাঁর কলমে ছিল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা অতি বিনীত—''তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার/ তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ/ রঙ্গভূমি ভালোবাসি হৃদে সাধ রাশিরাশি/ আশার নেশায় করি জীবনযাপন।'' সেই নেশায় তিনি জীবনযাপন করেছেন, সেখানে কোনও ফাঁকি নেই...। যতদিন বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ থাকবে, ততদিন তাঁর নাম বেঁচে থাকবে...।''

গিরিশের জীবনপ্রতিমার চালচিত্র নির্মাণপর্ব

জীবনে বহু দুঃখ আঘাত, বহু মৃত্যুশোক তিনি পেয়েছেন, যা নিজের অজান্তেই তাঁকে এক মহালগ্নের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিল। তিনি বলতেন, ''শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে বিপত্নীক হওয়ার দুঃখ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'' ভগবানে বিশ্বাস তাঁর ছিল না এবং তা রীতিমতো দম্ভ সহকারে প্রচারও করতেন। কিন্তু গিরিশের দম্ভ পদে পদে চূর্ণ করে, তাঁর সংশয় দূর করে ঈশ্বর কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে যে অবিশ্বাসী গিরিশের মনে অটুট করে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বাসের সুদৃঢ় সৌধ, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। ভাগলপুরে বেড়াতে গিয়ে গহ্বরে নেমে, বের হওয়ার পথ না পেয়ে গিরিশ বন্ধুদের কথায় ঈশ্বরকে স্মরণ করেন এবং অলৌকিকভাবে পথ পান। আবার কলকাতা আসার পথে যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেলে প্রতিবেশীর কাছে ভিক্ষুকের মতো সাহায্য চাইতে বাধ্য হন। গিরিশের জীবন-প্রতিমার চালচিত্র নির্মাণ চলছিল—কোন রং-তুলির টানে ঈশ্বর সেই প্রতিমাটিকে সম্পূর্ণ করবেন, সে তিনিই জানতেন! ওই এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমন যেন তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক বছর। আবার পারিবারিক বিপর্যয়, সেজন্য তখন থিয়েটারে যাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। অফিস থেকে ফিরে রুগ্ন স্ত্রীর সেবা করে ও সমস্ত রাত্রি বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন প্রায়ই। গ্রন্থপাঠে অনুরাগ তাঁর বাল্যাবধি। স্ত্রী সংসারের মায়া ত্যাগ করলেন। গিরিশ মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে নিজের অসহনীয় মর্মবেদনা প্রকাশ করলেন কাব্যিক ভাষায়—''তিন দশক পূর্ণকায় জীবন প্রবাহ ধায়/ মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।''

দিব্যজীবনপ্রভাবে

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে আসার পর গিরিশের প্রথম নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। সে-নাটকের গানে 'পতিতপাবনে'র প্রতি যেমন বিশ্বাসের চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তেমনি দোলায়িত চিত্তের

সংবাদটুকুও অবারিত : ''ডাকে হে পতিত তোমায়/ পতিত-পাবন পুরাও সাধ/ দীনের ঠাকুর, কোথায় গৌরচাঁদ/ আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দলে/ দাও হে প্রেমসুধার স্বাদ।''

কিন্তু 'বুদ্ধদেবচরিতে'র গানে গিরিশ নিঃসংশয়। এ-নাটকে দেববালাদ্বয়ের চরিত্র সংগীতনির্ভর। বুদ্ধের তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রদান অথবা বুদ্ধের প্রতি অলৌকিক নির্দেশের জন্যই এই চরিত্র পরিকল্পনা। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেববালাদের সুবিখ্যাত গান 'জুড়াইতে চাই কোথা জুড়াই' বুদ্ধচিত্তের উদ্বোধক। তিনটি স্তরে গানটি নাটকে পরিবেশিত। প্রথম দুটি স্তবক গীত হয়েছে সিদ্ধার্থ ও গোপার মিলনকুঞ্জে কিন্তু তৃতীয় অংশটি একমাত্র সিদ্ধার্থের কাছে—প্রায় স্বগতোক্তির মতো : ''কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল/ কে জানে কেমন, কি খেলা হলো/ প্রবাহের বারি—রহিতে না পারি/ যাই-যাই কোথা?—কূল কি নাই?... যে আছ চেতন ঘুমাও না আর/ দারুণ এ ঘোর, নিবিড় আঁধার/ কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ/ তোমা বিনা আর নাহিক উপায়/ তব পদে তাই শরণ চাই।''

গানটির সর্বত্র বুদ্ধ-চিন্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেও একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তি দুটিতে গিরিশচন্দ্র যে শরণাগতির সংকেত দিয়েছেন তা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব, কারণ কোনও নির্দিষ্ট দেবতার কাছে আত্মনিবেদন বুদ্ধের সাধনার লক্ষ্য নয়। 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটকেও তার কোনও পরিচয় নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় নাট্যকার স্বয়ং বুদ্ধের চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন এবং এই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ উপস্থিতি ঘটেছে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের আলোকে এই শরণাগতির মূল্য বিশেষ অর্থবহ।

'জনা' নাটকে চরিত্র হিসাবে 'জনা'-র পর পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'বিদূষক' চরিত্র। এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের রাজবয়স্য, লোভী ও কৌতুকী মাত্র নয়। এর পরিকল্পনায় গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি ও ভক্তিভাব প্রদর্শিত হয়েছে। সে নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার প্রার্থিত 'মুরলীধর' রূপ প্রদর্শন করেছেন। তার মুখে তীব্র কৃষ্ণদ্বেষ ও অন্তরে অটল সহজ ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সহজ ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ এবং তাঁর উপদেশ ছিল লোকভাষাভিত্তিক, সেই সুরেই কথা বলেছে 'জনা'র প্রচ্ছন্ন ভক্ত বিদূষক : ''আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশবার হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে তরে যায়।'' এমন সরল, প্রভুভক্ত চরিত্র এ-পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। ''এক নামে মুক্তি পায় নরে/ এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে/ এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।''—এই বিশ্বাস বিদূষক চরিত্রের প্রধান স্তম্ভ। তার কোনও বাহ্যিক 'বর' গ্রহণের দরকার নেই, সে জানে, ''হরি দয়াময়, নাম কল্লেই উদয় হন।''

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর গিরিশের নাটকে উদাসী পাগল চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। বহু নাটকেই তাঁর বাণীর প্রভাব লক্ষ করা যায় যেমন—''দুহাতে দুমুঠো ধুলো ধর না কেন, বল এই আমার টাকা, এই আমার টাকা'' [নসীরাম], ''যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি/ বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড/ ঈশ্বর, যিহোবা, যিশু নামে নানাস্থানে/ নানা জনে ডাকে সনাতনে।'' [কালাপাহাড়], ''মুখে বলতেম নিষ্কাম ধর্ম, নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না [মায়াবসান], ''সরল প্রাণে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা/ নইলে নাচে দুবেলা—মহামায়া করে যে হেলা'' [অভিশাপ] ইত্যাদি।

ছেলেবেলায় গিরিশ ঠাকুমার মুখে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতের গল্প শুনতেন। ব্রজবাসীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাওয়া বালক গিরিশ মেনে নিতে পারেননি। 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র'

গ্রন্থে হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''অশ্রুসিক্ত বালক প্রশ্ন করিল, 'কৃষ্ণ চলে গেলেন, আবার কবে এলেন?' খুল্ল পিতামহী বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, 'আর ভাই এলেন না।' গিরিশ ব্যথিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কখনও এলেন না?' বৃদ্ধা তেমনি কাতর-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'না ভাই।' আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন হইল 'আর মোটে না?' কোন উত্তর না পাইয়া মর্মাহত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। তিন দিন আর পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিতে আসিল না।'' গিরিশ বলিতেন, ''বুড়ীর গল্পে আমার মনে এমন গভীর বেদনার উদয় হয়েছিল যে এখনও মনে হলে আমার মনে গভীর দুঃখ হয়। আমি মাথুরলীলা এখনও পড়তে পারি না।''

এই মনোভাবই পরবর্তী কালে গিরিশকে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যতনুর অন্তিম সংস্কারে শ্মশানে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে। তাঁর প্রাণধন, জীবনের ধ্রুবতারা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির সংবাদ এক ভক্ত তাঁকে দিলে তিনি দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে বলেন, ''তোমার যা ইচ্ছা হয় বলো, কিন্তু আমি তো নিজে চোখে তা দেখিনি, অতএব ওকথা আমি বিশ্বাস করি না!'' পরবর্তী কালে গিরিশ যখনই প্রভুর দেহাবসানের সংবাদ কারও মুখে শুনতেন, এভাবেই তাঁর চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ মেটাতেন—''যদি আমার কান শোনে—'শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত', কানকে বলি, কত গুজবই তো শুনতে পাস, সবই কি বিশ্বাস করতে হয়? লোকে যা বলছে বলুক, আমি প্রভুর মৃত্যু সাক্ষাৎ দেখিনি, তাই আমি ওকথা মানি না!''

মাতৃসংগমে

গিরিশের দ্বিতীয় পত্নী কলকাতার সিমলার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের নাতনি সুরতকুমারী ছিলেন অতি পবিত্রস্বভাবা। তাঁর দুটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। দুই কন্যাই অকালে প্রাণ হারায়। পুত্রপ্রসবের পর স্ত্রীও সূতিকা রোগে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। ব্যথিত নাট্যকার লিখলেন, ''শূন্য প্রাণ, শূন্য এ-সংসার!'' কিন্তু প্রভুপদে 'বকলমা' দিয়ে তিনি নিজ অহং বলি দিয়েছেন, তাই শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, ''তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!''

গিরিশচন্দ্র একবার নেশার ঝোঁকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসেছিলেন, তাঁকে অধমের পুত্র হয়ে জন্মাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হননি, কিন্তু তাঁর লীলা সংবরণের পর গিরিশের সুলক্ষণ ছোট ছেলেটির জন্ম হওয়ায় তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল পতিতপাবনই এসেছেন ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে। শিশুপুত্রকে তিনি দেবতার মতো যত্নে পালন করতেন। শিশুর তিন বছর বয়সেও মুখে বুলি ফোটেনি। কিন্তু গিরিশভবনে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে তার উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যেত। ১৮৯০ সালের শেষভাগে যখন শ্রীমা বরাহনগরে সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বাস করছিলেন, ওই বালকের পীড়াপীড়িতেই গিরিশের প্রথম মাতৃচরণবন্দনার সৌভাগ্য হয়, এর পূর্বে নিজের 'পাপনেত্র'র প্রতি আস্থাহীন গিরিশ পবিত্রতাস্বরূপিণীর সমীপবর্তী হতে চাননি। কিন্তু হৃদয়ের ধন এই আকর্ষণটুকুও ভগবান রাখলেন না, মাত্র তিন বছর বয়সেই শিশুপুত্রের মৃত্যু হল। নিদারুণ পুত্রশোকগ্রস্ত গিরিশকে গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন বললেন, ''ঠাকুর তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছেন—চলো, দুজনে কোথাও চলে যাই।'' গিরিশ একটু ভেবে বললেন, ''তোমরা যা বলবে, ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি এখনই করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা করে সন্ন্যাসী হওয়ারও যে আমার সামর্থ্য নেই, ঠাকুরকে আমি যে বকলমা দিয়েছি।'' এরপর দুজনে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী তীর্থদর্শনে বের হলেন।

স্বামী বোধানন্দ জয়রামবাটী গিয়েছিলেন (সম্ভবত ১৮৯১-৯২ সালে) তাঁদের সঙ্গী হয়ে।

তাঁর স্মৃতিকথায় পাই—''বেলা ১০টা-১১টার সময় আমরা জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। গিরিশবাবু তালপুকুরে স্নান করিয়া একটি আম হাতে লইয়া ভিজে কাপড়েই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাড়িতে পৌঁছিয়া উঠানে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঐ দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।''

গিরিশচন্দ্র তখন ভাবে বিভোর, তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পমান, শ্রীমায়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে তিনি যেমন উপর দিকে চেয়েছেন, মায়ের মুখ দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, ''অ্যাঁ মা তুমি!'' এই বিস্ময়ের একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিবাহের প্রায় ছ-মাস পরে, তিনি দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে রোগ এত বৃদ্ধি পেল যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করে শমনের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। মৃত্যু যখন আসন্ন, অচেতন অবস্থায় তিনি এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি দর্শন করলেন। তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর, চোখ দুখানি অপূর্ব স্নেহজড়িত, পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি। এই করুণাময়ী দেবী গিরিশের সামনে এসে ''বাছা, এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর, অচিরেই আরোগ্য লাভ করবে'' বলে তাঁর মুখে মহাপ্রসাদ তুলে দিলেন। চেতনা লাভ করার পরেও যেন মহাপ্রসাদের স্বাদ তাঁর মুখে লেগে ছিল। সেই রাত থেকেই গিরিশের নাড়ী সজীব হয়ে উঠল এবং তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করলেন। সেই প্রথম গিরিশের মনে অলৌকিকের প্রতি আস্থা জন্মায়। প্রাপ্তবয়সেও গিরিশ এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন, ''সেই মহাপ্রসাদের অপূর্ব স্বাদ এখনও আমার স্মরণ আছে।'' 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে রানি ইচ্ছার মুখে তিনি এই দর্শনের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন—''নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ যে তেজঃপুঞ্জকায়।''

এই ঘটনার প্রায় ষোলো বছর পর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শন লাভ করে গিরিশ বুঝেছিলেন যে, ইনিই বহু পূর্বে মাতৃরূপে মহাপ্রসাদ বিতরণ করে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছেন। তবুও মায়ের মুখ থেকে সত্য জানবার জন্য একজনকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, শ্রীমা কখনও তাঁকে ওইভাবে দর্শন দিয়েছেন কি না। মা স্বীকার করলেন। এরপরেও সংশয় ঘোচেনি। একদিন গিরিশ সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলেন, ''তুমি কি রকম মা?'' গিরিশকে উপলক্ষ্য করে উচ্চারিত মায়ের আশ্বাসবাণী যুগ যুগ ধরে ভক্তপ্রাণের শান্তিবারি—''আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।''

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহের ছায়ায় গিরিশ বড় শান্তিতে কটা দিন কাটিয়েছিলেন। মাঠে ঘাটে তিনি কৃষকদের সঙ্গে বেড়াতেন, পেট ভরে মায়ের কাছে খেতেন আর পল্লির স্নিগ্ধ পরিবেশে শস্য-মাটি-লতা-পুষ্পের মধুময় আয়োজনের সুরে সুর মিলিয়ে আকুল হয়ে গাইতেন—''মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভালবাসা তো কল্পি ভবে/ একলা এলে একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরচ তবে/ কে তুমি বলছ আমি, দেখ ভেবে আর ভাববি কবে/ ভাঙবে মেলা ঘুচবে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে।'' এ-গানটি তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে গীত হত। কখনও বা আবার জ্বলন্ত বিশ্বাসে ভর করে গাইতেন—''কি ছার কেন মায়া/ কাঞ্চন কায়া তো রবে না/ দিন যাবে দিন রবে না তো/ কি হবে তোর তবে/ আজ পোহালে কাল কি হবে/ দিন পাবি তুই কবে/ সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ/ বেলাবেলি চল রে চলি, সাধি আপন কাজ।''

গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস প্রতিস্থাপিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের উপরেও। প্রথমদিকে তিনি মাকে গুরুপত্নীরূপেই দেখতেন। পরে যখন মায়ের জগজ্জননী স্বরূপ তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়, তিনি কোনও রাখঢাক না করেই

মায়ের স্বরূপ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রচার করতেন—''ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সবরকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের মোট পাঁচটি নাটক দেখেছিলেন—চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস, বৃষকেতু ও দক্ষযজ্ঞ। তার মধ্যে একমাত্র 'দক্ষযজ্ঞ'তেই গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন। শ্রীমাকে 'সত্য জননী' জেনে গিরিশের মন অপার শান্তি লাভ করেছিল। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। নাটকে অভিনয় করা একরকম ছেড়েছেন, নাটক লেখেন ও পরিচালনা করেন। মাকে নিজের সৃজনশীল কর্ম দেখাবার সাধ জাগে ভক্তভৈরবের। 'শ্রীমা' গ্রন্থে আশুতোষ মিত্র স্মৃতিচারণ করেছেন : ''একদিন গিরিশচন্দ্র শ্রীমাকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যান এবং রয়েল বক্সটি তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দেন। বড় হাতপাখার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' অভিনয় হইতে থাকে। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'ভণ্ড সাধক' রূপে দেখা দিলেন। যখন থাকমণিকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবেনই শিখাইবেন বলিলেন, শ্রীমা হাসিতে হাসিতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—'এ বয়সে আর কেন?' আবার বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেম দৃষ্টে 'আহা! আহা!' করিলেন।''

স্বামী শান্তানন্দ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বাগবাজারে উদ্বোধনে একদিন গিরিশবাবু এলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। তখন তিনি বৃদ্ধ। মাকে প্রণাম ও কুশল প্রশ্নের পর করজোড়ে নিবেদন করলেন—''মা, অনেকদিন হল থিয়েটারে আছি। আর ওসব ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে একদিন আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই, আর ঐ হবে আমার শেষ অভিনয়।'' গিরিশবাবুর প্রার্থনায় সম্মত হয়ে শ্রীমা ডঃ কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্জের ব্যবস্থাপনায় রাধু, মাকু ও অন্যান্য মহিলা ভক্তদের নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ 'পাণ্ডব-গৌরব' ও 'রঙ্গরাজ' নাটকদ্বয় দেখতে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন উপলক্ষ্যে থিয়েটার সেদিন একটু আগেই সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য গিরিশবাবুর যত্নেরও ত্রুটি ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ছিল বক্সের ব্যবস্থা। প্রথমে আরম্ভ হল নাটক 'পাণ্ডব-গৌরব'। গিরিশবাবু 'কঞ্চুকী' চরিত্রে অভিনয় করছিলেন, সে অবন্তীর রাজা দণ্ডীর ব্রাহ্মণ ভাঁড়। যখন দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে কথা বলতে দেখা গেল, শ্রীশ্রীমা বেশ উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠলেন, ''ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।'' অভিনয়ে যখন কৃষ্ণ কঞ্চুকীকে দিয়ে সুভদ্রাকে বলে পাঠালেন মহামায়ার আরাধনা করতে, তখন ধীর স্থিরভাবে বসে আছেন শ্রীশ্রীমা। রাত তখন অনেক হয়েছে। কিন্তু নাটক এমন জমে উঠেছিল যে কারো সেকথা স্মরণ ছিল না। শেষ অঙ্কে যখন কালীমূর্তির আবির্ভাব হল এবং দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র একত্র হল, তখনই শাপভ্রষ্টা উর্বশীর মুক্তি হল। দেবীর সহচরী যোগিনীগণ তখন গান ধরেছেন—

''হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে,/ মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে তো দেখ না চেয়ে!/ বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি/ এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী,/ কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে।''

স্বামী শান্তানন্দ দেখলেন এইসময় মা গভীর

ভাবে মগ্না। এইভাবে তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন।

'পাণ্ডব-গৌরব' অভিনয় শেষ পর্যন্ত দেখে শ্রীশ্রীমা বেশি রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে 'রঙ্গরাজ' অভিনয় না দেখেই উদ্বোধনে ফিরে আসেন, তখন রাত্রি দেড়টা।

লজ্জাশীলা শ্রীশ্রীমা গিরিশের সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে থাকতেন এবং বিশেষ কথা বলতেন না। 'সত্য জননী'র এমন আচরণে গিরিশ অভিমানভরে বলেছিলেন, ''তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হয়েছেন ছবি, আর তুমি হয়েছ বৌমা।''

১৩১৪ বঙ্গাব্দে গিরিশভবনের দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীমার উপস্থিতি মনেপ্রাণে কামনা করে গিরিশ সারদানন্দজীর দ্বারা জয়রামবাটীতে চিঠি লেখালেন এবং মায়ের সম্মতি পেয়ে মা ও তাঁর সঙ্গিনীদের আসার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর তখন বেশ খারাপ। তথাপি তিনি না এলে গিরিশ পূজাই করবেন না বলে বেঁকে বসেছেন, তাই করুণাময়ী জননী তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করলেন। শ্রীমায়ের সামনেই কল্পারম্ভ হল। বলরামভবনে আর গিরিশভবনে পূজার দুদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করায় মায়ের শরীর আরও খারাপ হল। স্থির হল, সন্ধিপূজার সময় তিনি আর আসবেন না। গিরিশ গভীর বেদনায় সেকথা মেনে নিলেও মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সন্ধিপূজার লগ্ন ছিল গভীর রাত্রে। তার কিছু আগে মা গিরিশভবনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে হেঁটে তিনি গিরিশের খিড়কিদুয়ারে উপস্থিত হয়ে দ্বারে আঘাত করে বললেন, ''আমি এসেছি।'' বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়িয়ে পড়ল মায়ের শুভাগমন বার্তা। গিরিশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গদগদস্বরে বললেন, ''আমি ভেবেছিলুম আমার পূজাই হল না!'' শ্রীমা প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভক্তরা তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তিনদিনই শ্রীমা গিরিশের আত্মীয়স্বজন, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত সকলের ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন—সম্পূর্ণ হল গিরিশের মহাপূজা!

মহাযাত্রার প্রস্তুতি

জীবন যেন এক নদী। নদীর তিনটি প্রবাহ : (১) পার্বত্য প্রবাহ—যখন সে তীব্রবেগে গিরিকন্দর ভেদ করে বের হয়, অসংখ্য উপলখণ্ড-বিস্তৃত বাধাসংকুল পথ পেরিয়ে ছুটে চলে দুর্বার গতিতে, (২) তারপর মধ্যপ্রবাহ—সমতলে এসে গতি হয় ধীর, দুই পাড়ে পলি সঞ্চিত করে উর্বর কৃষিক্ষেত্র তৈরি করে নদী হয় সৃজনী; (৩) অন্তিমে তার মন্থর গতি, সাগরসঙ্গমে যাত্রা—অজস্র ধারায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সে আপনাকে হারাতে ধেয়ে চলে তার সান্তত্বকে অনন্তত্বে বিলীন করে দিতে! গিরিশচন্দ্রের জীবনও কিছুটা এমনই। প্রথম জীবনে তিনি বোহেমিয়ান—দুরন্ত, ঈশ্বর-অস্তিত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী, উদ্ধত, দাম্ভিক। মধ্য যৌবনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন নানা সৃষ্টিশীল কাজে। অবশেষে দেবমানবরূপী পরশপাথরের স্পর্শে তিনি সোনা হলেন। 'উন্মত্ত-ভৈরব' প্রখ্যাত হলেন 'ভক্তভৈরব' নামে! জীবনের মোহনা-বেলায় গিরিশ আপনাকে শতধাবিস্তৃত করে যেমন বাংলার সাহিত্য-সংগীত-অভিনয়জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি তাঁর ভাবভক্তি-শরণাগতি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছে।

১৯০৬ সাল থেকে প্রতি বছর হেমন্ত ঋতু সমাগমে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশ বেড়েই চলল। ১৯০৯-১০ সালে তিনি কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করে চারমাস ছিলেন। সেবাশ্রমের রোগীদের তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন এবং এই চিকিৎসায় শহরে তাঁর বেশ সুনাম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রিয়তম বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। স্বামী প্রেমানন্দ তখন কাশীতে

গিরিশবাবুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, ''শ্রীযুত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হচ্ছে। আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। আহা, তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল, 'তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে।' ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি! যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে হ্যাক্-থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন—তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়স, কিন্তু বালকের মতো স্বভাব দেখি।... শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা।... তাঁর চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে।''[২৮]

কাশীতে থাকাকালে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শংকরাচার্য' রচনা করেন। ওইসময় তাঁর মন সর্বদা ধর্মভাবে পূর্ণ থাকায় গ্রন্থে তার প্রতিফলন ঘটেছে। রচনা সম্পূর্ণ হলে তিনি শঙ্কর-টিলায় গিয়ে শংকরাচার্যের বিগ্রহের সামনে তা পাঠ করে আসেন ও নাটকের প্রথম অভিনয়ের উপার্জিত অর্থ শংকর মঠে দান করেন।

তাঁর অভিনীত সর্বশেষ নাটক—'বলিদান'। ১৫ জুলাই ১৯১১, মিনার্ভা থিয়েটার। নাটকের টিকিট বিক্রি একেবারেই কম, মাত্র ৫০ টাকার। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, করুণাময়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন গিরিশচন্দ্র। নাটকের দিন বিকেলে তুমুল ঝড়-তুফান। কিন্তু শুধু গিরিশের নামের জাদুতেই ধীরে ধীরে ঝড়বাদল উপেক্ষা করে লোকসমাগম হতে লাগল এবং টিকিট বিক্রি ৪০০ টাকা ছাড়িয়ে গেল। গিরিশের শরীর তখন খুবই খারাপ। হাঁপানির টান বেড়েছে। এই খারাপ আবহাওয়ায় অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করলে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতির আশঙ্কায় অনুরাগীগণ তাঁকে অভিনয় থেকে বিরত হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু গিরিশের মতে, তা দর্শকদের প্রতারিত করা। তাঁর এক কথা—শ্রীরামকৃষ্ণকে বকলমা দেওয়ার পর নিজ দেহের প্রতি তাঁর আর অধিকার নেই, এ-দেহ ঠাকুর রাখতে হলে রাখবেন, নচেৎ ভেঙে দেবেন। আর 'বলিদান' নাটকের বিষয়বস্তুও তো ওই, অপরের জন্য আত্মবলি! অগত্যা শুভানুধ্যায়ীদের অনুনয় ব্যর্থ হল এবং পরিণতিও যা হওয়ার তা-ই হল—মহাকবির মহাযাত্রা ত্বরান্বিত হল।

তুমি কি গো পিতা আমাদের

থিয়েটারের উপর যখনই কোনওরকম বিরুদ্ধতার আঁচ এসেছে, গিরিশচন্দ্র পক্ষিমাতার মতো ডানা বিস্তার করে যেন আপন শাবক রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নারীচরিত্রে মহিলাদের দিয়ে অভিনয় করানো ভদ্রসমাজ ভাল চোখে দেখেনি, সংবাদপত্রে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদমূলক লেখালেখি শুরু হয়। এ-সময় কলম ধরেছিলেন গিরিশ। তাঁর প্রয়াণে অভিনেত্রীরা যেন পিতৃহারা বালিকার মতো অকূল শোকপাথারে নিমজ্জিত হন। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরী লিখেছিলেন, ''আমরা গুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কথা জানি না, তাঁহার ন্যায় জগতে আর কেহ অত পুস্তক লিখেছেন কিনা জানি না, তাঁহার নাটকের দোষগুণের বিচার করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমাদের নাই, তাঁহার ধর্মাধর্ম, দোষগুণ কখনও বিচার করি নাই বা সাধ্যও নাই! শুধু এইটুকু জানি, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন—তিনি আমাদের গুরু—পিতা—শিক্ষাদাতা—তিনি আমাদের হৃদয়ে সামান্য একটু জ্ঞানালোক দিয়াছেন,... মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রমলব্ধ অর্থে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন—আর আমাদের ঘৃণা না করিয়া যথেষ্ট আদর করিয়াছেন। তাই তাঁর বিয়োগে আমরা পিতৃহারা।''

আর এক খ্যাতনামা অভিনেত্রী নরীসুন্দরী লিখেছিলেন, ''আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'পুণ্যের ছাপমারা কুলে যখন তোর জন্ম নয়, তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করিতে থাকি।' কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আমার মতো অভাগিনীর মুখ দিয়াও চৈতন্যলীলার নিতাইয়ের, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়াছিলেন।''

ভক্তভৈরবের রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা

এই মহানায়কের মহাপ্রস্থানটি লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হয়েছে :

''অপরাহ্নকাল হইতে [গিরিশ] প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিলেন, এইসময়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারই দুই-এক কথার উত্তর দিতেন মাত্র।... ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কখনও 'চলো', কখনও 'নেশা কাটিয়ে দাও', কখনও 'রামকৃষ্ণ' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

''রাত্রি ৮টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। দানিবাবু আসিয়া যখন কাতরকণ্ঠে 'বাপি—বাপি' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন পুত্রবৎসল পিতা কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন... ক্রমে আচ্ছন্নভাব বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, 'মহাশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।'

সেদিন অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন...। রাত্রি ১১টার সময় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার ইষ্টদেবের নামগান আরম্ভ করিলেন। 'রামকৃষ্ণ হরিবোল' ধ্বনিতে পল্লী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের (বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ সাল) সময় গিরিশচন্দ্রের অন্তিমশ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে বিলীন হইল। তিনদিন অনিদ্রার পর মহাকবি মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

''পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ ও বহুবিধ জনসমাগমে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার শেষদর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের এরূপ আগ্রহ, যে, জনতার সুশৃঙ্খলতাসাধন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নাট্যসম্রাটকে কিরূপে সাজাইয়া কিরূপ সমারোহে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলবাবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল—গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের না সাধারণের!

''বিচিত্র খট্টায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে 'রামকৃষ্ণ' নাম লিখিয়া দিয়া নাট্যসম্রাটকে বাহিরে আনয়ন করা হইল। ফটোগ্রাফারগণ আসিয়া সম্মুখ-পথ রোধ করিলেন।... হুড়াহুড়ি দর্শনে আমরা বিনীতভাবে ফটোগ্রাফারদিগকে নিবেদন করিলাম, 'মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া ফটো গ্রহণ করিবেন। এ গলি-পথে এত জনতায় আমাদিগকে মহা বিব্রত হইতে হইয়াছে।' দ্রুতবেগে জনতা গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রবাহিত হইল।

''দেখিতে দেখিতে কাশী মিত্রের শ্মশান ঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশে রাধাকান্ত দেবের মুমূর্ষু-নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট পর্যন্ত মনুষ্য ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।... প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত

হইয়াছিলেন।

''গিরিশচন্দ্রকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় সহস্রকণ্ঠে 'রামকৃষ্ণ হরিবোল' নাম গীত হইতে লাগিল। সেই পরমসময়ে, অগ্নিদেব শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই বিশাল বপু গ্রাস করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আর-একবার মহাকবিকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিবার জন্য শ্মশানভূমিতে চতুর্দ্দিকস্থ নির্ব্বাপিত চিতাস্তূপের উপর এত জনতা হইল যে কত লোক স্থলিতপদ হইয়া শ্মশান-শয্যায় গড়াগড়ি দিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। বহুশত ব্যক্তি তাঁহার পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন, কেহ-কেহ বা পরম ভক্তিসহকারে খট্টাস্থ ফুল মস্তকে স্পর্শ করিয়া দেবতার নির্ম্মাল্যস্বরূপ সযত্নে লইয়া যাইতে লাগিলেন।...

''দেখিতে-দেখিতে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধূনা ও কর্পূরে ব্রহ্মণ্যদেব, শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমিষ মধ্যে লক্ষ-লক্ষ নাট্যমোদীর প্রিয়দর্শন, বীণাপানি বাগ্দেবীর বরপুত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণ-রজঃপূত সেই বিশাল বপু ভস্মে পরিণত করিলেন। আর এ বিপুল সংসার খুঁজিয়া সে উজ্জ্বল প্রতিভা-মুকুট-মণ্ডিত দেহের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র কয়েকটি ভক্ত এবং বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীগণ নববস্ত্র পরিধানে নব তাম্রকুণ্ডে ভস্মাবশিষ্ট চিতা হইতে যত্নসহ অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সব শেষ হইল।''

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন : ''শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা পুষ্টির জন্যই তবে আমার পূর্ব জীবনে দুষ্কৃতানুষ্ঠান, আমিও তো শ্রীভগবানের লীলা-সহচর। হে ভগবান! তোমার সহিত তবে আমার নিত্যসম্বন্ধ। তবে অনন্তগুণে দুষ্কৃতকারী বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেও আর আমার কষ্ট নাই। হে কৃপাসিন্ধু—তোমার চিরদাসকে তুমি যে সাজে যতবার ইচ্ছা সংসারে আনিতে চাহ—আনিও; তোমার চিরপদাশ্রিত—এই জ্ঞানটুকু কেবল আমায় ভুলাইয়া দিও না।''

মৃত্যুর পূর্বে গিরিশচন্দ্রের সুদৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত সজ্ঞান উক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণ পদাশ্রয়েই নিবেদিত : ''জয় রামকৃষ্ণ! চলো চলো।'' শ্রীশ্রীমা গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুপ্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন : ''যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হলো, যেন ঐ চিন্তাটিতে ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে। সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।''

পরমপুরুষের অংশস্বরূপ লীলাপার্ষদ সেই মহামানবের উদ্দেশে জানাই মুগ্ধ বিনম্র প্রণাম।

সহায়ক গ্রন্থ

১। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৮৫)

২। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *গিরিশচন্দ্র* (দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, ১৯৭৭)

৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭)

৪। Swami Chetanananda, *Girish Chandra Ghosh--A bohemian devotee of Sri Ramakrishna* (Advaita Ashrama : Mayavati, 2009)

৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা*, ভাগ ২ (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১)

৬। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১)

৭। সংকলন : স্বামী চেতনানন্দ, *মাতৃদর্শন* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১)

৮। সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ২০১২), নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধ '*আনন্দরূপিণী*'